বিবেকদর্শন

স্বামী বিবেকানন্দের ‘কর্মযোগ’ প্রসঙ্গে

স্বরাজ মজুমদার

সাধককবি প্রেমিকের একটি গানে আছে, ‘‘বড় ধুম লেগেছে হৃদিকমলে/ মজা দেখিছে আমার মনপাগলে/ হতেছে পাগলের মেলা খ্যাপাতে খেপীতে মিলে/ আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে ঢলে॥’’ আবার রামপ্রসাদ গাইছেন : ‘‘খ্যাপার হাটবাজার মা তোদের খ্যাপার হাটবাজার।’’ বাস্তবিক, এই জগৎ তো খ্যাপার হাটবাজারই! জগৎ ওই ‘খ্যাপা’, তাঁকে শিব বলুন আর যাই বলুন, ‘খেপী’ অর্থাৎ মহামায়ার সাহায্যে প্রকাশ করছেন। কেন? তাঁর লীলা, খেলবেন বলে। একা থাকতে তো ভাল লাগে না! তাই উপনিষদ বলছেন, ‘একোঽহং বহু স্যাম্’—স্বরূপত, পরমার্থত আমি এক হয়েও বহু হব। বহু না হলে তো আর খেলা যায় না! তাই নিজের শক্তি বা মহামায়ার সাহায্য নিয়ে শিব নিজের সত্তা ভুলে বসে আছেন। তাই তো শিবকে বলি ‘ভোলানাথ’। খেলার ছলে নিজের স্বরূপ ভুলে ‘শিব’ যেন ‘জীব’ হয়ে গেলেন। তারপর আবার মানুষ হয়ে, জীব হয়ে, সেই নিত্য শিবসত্তার পূর্বস্মৃতি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। এটা কি পাগলামি নয়? কারণ যত কিছু ‘যোগ’ তা তো এই পূর্বস্মৃতি ফিরে পাওয়ার জন্যই।

কথামৃতে[১] শ্রীরামকৃষ্ণ বরাহ অবতারের গল্প বলেছেন : ‘‘হিরণ্যাক্ষ বধ করার জন্য (বিষ্ণু) বরাহ অবতার হলেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হল, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না।... কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে রয়েছেন।... শিব গিয়া তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন,... (শেষে) ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙে দিলেন। ঠাকুর হি-হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।’’ হাসির কারণ কী? কারণ তাঁর দেহাত্মবোধ নষ্ট হয়ে নিজ স্বরূপের স্মৃতি ফিরে এল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন : ‘‘মহামায়ার কার্য কিছু বুঝা যায় না।’’ লীলা অনির্বচনীয়। স্বামী বিবেকানন্দও বলছেন : ‘‘এ-জগতের মাথামুণ্ডু কিছু নেই—কোন যুক্তি, কোন কারণ ঈশ্বরকে বাঁধবে? এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চে খেলুড়ে ঈশ্বর নিজেই কাঁদছেন, নিজেই হাসছেন—সব চরিত্রে তিনিই অভিনয় করছেন। বাস্তবিকই এটা মজার ব্যাপার...। কী মজার জগৎ এটা এবং এর মধ্যে সব থেকে রগুড়ে চরিত্র আমার প্রিয়তম অনন্ত ঈশ্বর!’’[২] অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই বলেছিলেন, ‘‘...আপনি মজার লোক। আপনার কাছে মজা খুব’।’’[৩]

ভক্তের উপাস্য ‘ভগবান’ বা ‘ঈশ্বর’। যোগীর লক্ষ্য ‘আত্মা’ বা ‘পরমাত্মা’। জ্ঞানীর অভীষ্ট ‘ব্রহ্ম’।

বস্তু একই; কেবল সাধনভেদে নামভেদ। 'যোগ' কী? যোগ হচ্ছে উপায় যা লক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করে দেয়—ভক্তকে ভগবানের সঙ্গে, যোগীকে পরমাত্মার সঙ্গে, জ্ঞানীকে ব্রহ্মের সঙ্গে—সঠিক বলতে গেলে, ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধের সঙ্গে অন্বিত করে। এই অর্থে ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও রাজযোগ—এই চার যোগের উদ্ভব। কর্মযোগও এক ধরনের প্রক্রিয়া যার দ্বারা চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে আমরা আপাতলুপ্ত স্বরূপজ্ঞান ফিরে পেতে পারি।

সনাতন হিন্দু বা বৈদিকধর্ম এত উদার যে সকলের জন্যই এখানে মুক্তির কোনও না কোনও পথ খোলা আছে। শুধু প্রকৃতি বা সংস্কার অনুসারে এক-একজন এক-এক পথ অনুসরণ করেন—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—যার যা পছন্দ। অন্য কোনও ধর্মে এমনটি নেই। অবশ্য মনে রাখতে হবে কোনও যোগই watertight compartment বা সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট নয়। সব যোগের মধ্যেই অন্য যোগের মিশ্রণ আছে। জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি, আবার ভক্তির মধ্যে জ্ঞান। তেমনি কর্মযোগের মধ্যেও অন্যান্য যোগের মিশেল আছে। বলা যায় সব যোগের Highest Common Factor বা H.C.F. এই কর্মযোগ। এযুগে স্বামীজী তাই কর্মযোগের ওপর এত জোর দিয়েছেন। প্রথম প্রথম এই সত্য বোঝা না গেলেও সাধন করতে করতে ক্রমশ এটি উপলব্ধি করা যায়।

গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলছেন : ''সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥'' (৫।৪) অর্থাৎ অজ্ঞেরা বলে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ—এ-দুটি আলাদা। কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা তা বলেন না। কারণ দুয়েরই ফল মোক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : ''জপধ্যান করাও কর্ম, নিত্য-অনিত্য বিচার করাও কর্ম। কর্ম ছাড়া এক দণ্ড থাকার যো নেই।'' গীতাতেও একই কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ : ''ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।/ কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥'' (৩।৫)—প্রকৃতি বা মায়াজাত গুণের বশীভূত হয়ে সকলেই কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই অর্জুনকে বলছেন, ''নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।/ শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥'' (৩।৮)—অকর্ম থেকে কর্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করে দেহধারণও সম্ভব হবে না। তাই তুমি নিয়ত কর্ম করো।

এখন স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' প্রসঙ্গে আসি। প্রশ্ন উঠতে পারে : কর্মযোগ কি স্বামীজীর দ্বারা প্রবর্তিত? তা যদি না হয় তো 'স্বামীজীর কর্মযোগ' বলা হচ্ছে কেন? তার উত্তর : না, যোগ হিসাবে কর্মযোগ বরাবরই ছিল। গীতার মূল সুরটিই তো কর্মযোগের। তবে কালের প্রভাবে তা চাপা পড়ে ছিল, বিশেষত আচার্য শংকরের মতানুসারী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদের ব্যাখ্যার দাপটে। তাঁরা কর্মের বিরোধিতা করে এসেছেন এই যুক্তিতে—আচার্য শংকর বলেছেন কর্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তা মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করে। আমরা বলি, সন্ন্যাসমার্গে বা কর্মত্যাগ করে জ্ঞানমার্গে মোক্ষলাভ হয় ঠিকই, কিন্তু তা হয় কেবল জ্ঞানলাভের ফলে—শুধু কর্মত্যাগের জন্য নয়। এই জ্ঞানলাভ যে পরোক্ষভাবে কর্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির ফলেও হয় শংকর নিজেও সেকথা অস্বীকার করেননি।[৪] শংকর তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন, ঈশ্বরই সবকিছুর কর্তা, আমি তাঁরই ভৃত্য হয়ে যাবতীয় কর্ম করছি—এভাবে বিচারশীল হয়ে চিত্তকে আত্মস্থ করে কাজ করবে। যাই হোক, এখানে 'স্বামীজীর কর্মযোগ' বলতে স্বামীজীর দৃষ্টিতে কর্মযোগকেই বোঝাতে চাইছি। যেভাবে তিনি এযুগে কর্মযোগের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন সেটিই আমাদের আলোচ্য।

পাশ্চাত্যে, বিশেষত আমেরিকায় দেওয়া তাঁর বক্তৃতাগুলিকে একত্রিত করেই 'কর্মযোগ' গ্রন্থটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর ইংরেজি রচনাবলির

প্রথম খণ্ডে আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে এই কর্মযোগ, যেখানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই যোগের সমস্যা ও তার অব্যর্থ সুফলের ওপর আলোকপাত করেছেন স্বামীজী। আলোচনার সবটুকু একটি প্রবন্ধে আঁটবে না, তাই মূল কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই আমাদের চিন্তনকে সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রথম প্রশ্ন এই : সাধারণত আমরা কেন কর্ম করি? কে আমাদের কর্ম করতে বাধ্য করে? তার উত্তর : যা আগেই বলেছি, প্রকৃতি, মায়া বা অজ্ঞানতা। কর্মের মূলে আছে আমাদের জন্মজন্মান্তরের বাসনা। বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই আমাদের জন্ম ও দেহধারণ এবং তারপর কর্ম করা। সব কর্মেরই আবার ভাল-মন্দ ফল আছে এবং সেই ফলেই আমরা বাঁধা পড়ি। তাই বলা যায় কর্ম বন্ধনের কারণ। কর্মফল আবার তিনরকম—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও আগামী। এই তিন ফল ভোগের জন্যই সংসারে আমাদের অবিরত আসা-যাওয়া। যদি 'মুক্তি' আমাদের লক্ষ্য হয় তো যেমন করেই হোক এই কর্মফলের বন্ধন কাটাতে হবে।

কী করে এই বন্ধন কাটানো যাবে? কর্মযোগের দ্বারা। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন : ''যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।'' কাজের কৌশলটি শিখতে হবে। জানতে হবে। নতুবা কর্মের সহস্র বন্ধনে আমরা উত্তরোত্তর জড়িয়ে পড়ব। এযুগে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, কৌশল জানা না থাকলে অনর্থক শক্তির অপব্যয় হবে। কৌশলটি কী? গীতাকে অনুসরণ করে স্বামীজী বলেছেন : কর্মকে, সাধারণ দৈনন্দিন কর্মকেও 'যোগে' পরিণত করতে হবে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? তার উত্তরে স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, যদি নিষ্কামভাবে, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম বা যজ্ঞ করছি এই জ্ঞানে সব কাজকর্ম করা যায়, তাহলেই কর্মের দোষ দূরীভূত হয়ে তা যোগে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

গীতায় বলা হয়েছে : ''যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।/ তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥'' (৩।৯)—ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ছাড়া অন্য সব কর্ম বন্ধনের কারণ। তাই তুমি ভগবানের উদ্দেশে অনাসক্ত হয়ে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম করো। রাজযোগেও এই কথারই প্রতিধ্বনি : ''যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।/ যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'' (৯।২৭)—খাওয়াদাওয়া, দানধ্যান, হোম এবং তপস্যা যাই কর, তা সবই আমাকে অর্পণ করো। রামপ্রসাদ একটি গানে বলছেন : ''শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান, আহার করো মনে করো আহুতি দিই শ্যামা মারে।''

অর্থাৎ খাওয়াদাওয়া থেকে শোওয়া, ঘুমোনো সবই মায়ের পূজাজ্ঞানে করো, তাহলেই আপাত সাধারণ কর্মগুলিও অসাধারণ যোগে পরিণত হবে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়ে যাব। রামপ্রসাদের বহু যুগ আগে ব্যাসদেব তাঁর 'শিবমানসপূজনস্তোত্রে' ঠিক এই কথাটিই বড় সুন্দরভাবে বলেছেন : ''আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং/ পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।/ সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো/ যদ্যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥''—হে শম্ভু, তুমিই আমার আত্মা, পার্বতীই আমার বুদ্ধি, আমার ইন্দ্রিয়গুলি তোমার ভৃত্য, আমার শরীর তোমার মন্দির, তোমার পূজার জন্যই আমার বিষয়-উপভোগের চেষ্টা, তোমাতে সমাহিত হওয়াই আমার নিদ্রা, আমার চলাফেরার অর্থ তোমাকে বিধিপূর্বক প্রদক্ষিণ করা। আমার কথা তোমার স্তব—আমি যা-কিছু করি তা তোমারই আরাধনার জন্য।

এরকমভাবে কর্ম করলে কী হবে? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : শুভ ও অশুভ ফলবিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হও। জীবিতকালেই মুক্তিলাভ

করবে এবং দেহান্তে আমাকেই পাবে। (৯।২৮)

কর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে স্বামীজী একটু অন্যদিকে ফেরালেন। বললেন, কর্মের উদ্দেশ্য একটি নিখুঁত চরিত্র তৈরি করা। আমরা আজ যা হয়েছি, তা কর্ম করেই হয়েছি। ভবিষ্যতেও যা হব বা হতে চাই, তাও কর্মের মাধ্যমেই সম্ভব হবে। তাই কর্মের জন্যই কর্ম করো, নিঃস্বার্থ কর্ম করো; তাহলে তুমিই একদিন ভগবান যিশু বা ভগবান বুদ্ধ হয়ে যাবে। শারীরিক, বাচিক, মানসিক, কর্ম যে-ধরনের হোক না কেন, চরিত্রের উপর তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। আমার সৎ কর্ম ও সৎ চিন্তার প্রভাব যেমন আমার ও অন্যের শুভ সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করবে, সুদৃঢ় করবে, তেমনি আমার প্রতিটি অসৎ কর্ম ও অসৎ চিন্তা একদিকে যেমন আমাকে নিচে টেনে নামাবে, তেমনি অন্যদেরও ক্ষতি করবে এবং তার জন্য আমিই অপরাধী হব। কীভাবে এটি সম্ভব হয় সে-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন : ''একটা ঘরে কয়েকটা তারের বাদ্যযন্ত্র যদি এক সুরে বাঁধা থাকে, তাহলে একটিতে আঘাত করলে বাকি যন্ত্রগুলোও সেই সুরে আপনাআপনিই বেজে উঠবে।''[৫] ঠিক সেইরকম, আমি যখন কোনও কর্মে নিযুক্ত থাকি, তখন আমার মনে এক বিশেষ ধরনের স্পন্দন হয়; অন্যান্য যেসব মন ওই একই অবস্থায় আছে, আমার মানসিক স্পন্দনের দ্বারা সেই মনগুলিও অনুরণিত হবে—অন্তত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভাল বা মন্দ প্রত্যেক কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম।

স্বামীজী বলছেন, চিন্তার ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও তীব্র ও ব্যাপক, কারণ শুভ ও অশুভ প্রতিটি চিন্তার তরঙ্গ শত শত বছর মহাকাশে ভেসে বেড়ায়। উপযুক্ত গ্রহীতার জন্য তারা অপেক্ষা করে থাকে। সেই ভাবতরঙ্গ গ্রহণের জন্য যখন কোনও মন উৎসুক থাকে, প্রতীক্ষারত ওই সূক্ষ্ম চিন্তাতরঙ্গ তখন সমধর্মী সেই মনে প্রবেশ করে একই ছন্দে স্পন্দিত হতে থাকে। তাই দেখা যায় যারা কুচিন্তা ও কুকর্মে লিপ্ত, তারা ক্রমাগত অধিক পরিমাণে মন্দ কাজ করতে থাকে এবং ক্রমশ অধঃপতিত হয়। আবার বিপরীতটাও সত্য। যারা সৎকর্মে লিপ্ত থাকে, যাদের মন বায়ুমণ্ডলে ভাসমান সদ্ভাবনাগুলি গ্রহণের জন্য উন্মুখ, তাদের শুভসংস্কার গভীরতর হয় এবং তার প্রভাবে তারা আরও বেশি ভাল কাজ করতে থাকে। অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্মের এই দুটি মস্ত বিপদ। এগুলির প্রত্যক্ষ ফল তো ভুগতেই হবে, তার সঙ্গে আবার যুক্ত হবে অন্যদের পাপকর্মে প্রেরণা দেওয়ার বিষময় ফল। বোঝা কতদূর ভারি হয়ে যাবে? একবার চিন্তা করুন! এই কারণেই সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম, সৎ সঙ্গের ওপর এত জোর দেওয়া হয়, গুরুত্ব দেওয়া হয় সংযত জীবনযাপনের ওপর। স্বামীজী তাই বলেছেন, মুক্তির চাবিকাঠি আদর্শ চরিত্রগঠনের মধ্যেই নিহিত আছে।

স্বামীজী অবশ্য আমাদের আশ্বস্ত করার জন্য এও বলেছেন, কর্ম করতে গেলে প্রথমত একটু-আধটু স্বার্থবোধ আসতে পারে। কিন্তু ক্রমশ নিঃস্বার্থ হতে হবে। তাহলে ভিতরের শক্তি ও জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হবে। ব্যক্তিগত সুখ খুঁজতে গিয়ে আমরা স্বার্থপর হই বটে, কিন্তু এমন একদিন আসে যখন আমরা অনুতাপ করি : ''আমি তো সুখী নই!'' প্রকৃত সুখ নিঃস্বার্থপরতায়, সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি ঘটানোয়, যেখানে আমিত্ববোধ একেবারে থাকবে না, থাকবে শুধু অন্যের কল্যাণচিন্তা, সকলের মঙ্গলের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা। এটিই নৈতিকতার ভিত্তি। কর্মযোগ আমাদের নিবৃত্তির পথে নিয়ে গিয়ে, আত্মত্যাগের মাধ্যমে পূর্ণতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে এবং অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ ঘটায়। এই আত্মবিলুপ্তির প্রশ্নে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের কোনও প্রভেদ নেই।[৬] সব যোগেরই এটি সারকথা।

প্রশান্ত চিত্তে নিবিড় কর্ম করাই কর্মযোগের

আদর্শ। এখন প্রশ্ন : চিত্তকে প্রশান্ত করা যাবে কী করে? তার উত্তর—চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে। চিত্ত চঞ্চল হয় কেন? আমাদের মনে বাসনা তথা কর্মফলভোগের ইচ্ছা থাকে বলে। এক কথায়, আমিত্বই চিত্তচাঞ্চল্যের মূলে। বাসনা ও আমিত্বের জ্ঞান যতদূর হবে, যত নিঃস্বার্থ হব আমরা, ততই আমাদের মন শান্ত হয়ে আসবে। সেই মন দিয়েই তখন সবার হিতের জন্য নিবিড় কর্ম করা সম্ভব।

কর্মযোগের ওপর দেওয়া বক্তৃতাগুলিতে স্বামীজী দেখিয়েছেন, সব কর্মের সঙ্গেই ভাল এবং মন্দ মিশে থাকে। কর্মের ফল ভালও হয়, মন্দও হয়; আবার মিশ্র ফলও হয়। স্বামীজী বলেছেন, ভাল এবং মন্দ—দুটিই বন্ধন। ভালটি যেন সোনার শৃঙ্খল, আর মন্দটি লোহার। দুটিই আমাদের বেঁধে ফেলে। তাই সাবধান করে বলেছেন : কর্মফলের প্রতি আসক্ত হোয়ো না। 'কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।' প্রথমে ভাল কর্ম করে মন্দ কর্মের প্রভাব নষ্ট করো; তারপর ভাল-মন্দের পার হয়ে যাও। তুমি তো তোমার স্বার্থে কর্ম করছ না, করছ ভগবানের উদ্দেশ্যে। তবে ভাবনা কী? গীতা উদ্ধৃত করে স্বামীজী বলছেন, ''স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'' (২।৪০)—এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের অতি অল্প পরিমাণ অনুষ্ঠানও মহাভয় থেকে আমাদের ত্রাণ করে।

প্রশ্ন ওঠে, ভাল উদ্দেশ্যে কর্ম করতে গিয়েও যদি তার মধ্যে মন্দ ফল এসে যায়, তাহলে কর্ম না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাই শ্রেয় নয় কি? স্বামীজী বলছেন : না; কাজ অবশ্যই করব, কিন্তু দেখতে হবে মনে যেন তার কোনও ছাপ না পড়ে। হাত ও মাথা কাজ করুক, মন নিস্তরঙ্গ থাকুক। কথা মন নিয়ে, কাজ নিয়ে নয়। কী উদ্দেশ্যে কর্ম করছি, সেই motive বা অভিপ্রায়টি খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করি, তবে তা 'কর্মযোগ' হবে না।

কর্মযোগ প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিগ্‌দর্শন করিয়েছেন। তার প্রথমটি হল : কী কাজ করছি, সেটি বড় কথা নয়। কেমনভাবে করছি, কতটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে করছি, সেটাই বিবেচ্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে মা সারদার একটি কথা মনে পড়ে যায় : ''একদিন... একজন ঝাঁট দিয়া ঝাঁটাটি ছুঁড়িয়া একদিকে ফেলিয়া রাখিলেন। মা তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, 'ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে? তাছাড়া, এ সংসারে ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।' ''[৭] *(ক্রমশ)*

তথ্যসূত্র

১। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৪১৩-১৪

২। দ্রঃ *The Complete Works of Swami Vivekananda*, (Advaita Ashrama : Kolkata, 2011), Vol VI, p. 367 [এরপর, *CW*]

৩। *কথামৃত*, পৃঃ ১১৬৭

৪। দ্রঃ *CW*, Vol VII, 2012, p. 222

৫। দ্রঃ *CW*, Vol I, 2012, pp. 81

৬। দ্রঃ তদেব, p. 87

৭। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), অখণ্ড, পৃঃ ২৮৪